International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বংশলতিকার সন্ধানে

ড. তপোব্রত ভাদুড়ি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ –

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। বর্তমান প্রবন্ধে বিভূতিভূষণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে তাঁর পূর্বপ্রজন্মের ইতিহাস তথা বংশধারা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভূতিভূষণের প্রচলিত জীবনীগ্রন্থগুলি পাঠ করলে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে তথ্যগত অসামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। এছাড়া কিছু জায়গায় তথ্যের অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি ও অপ্রতুলতাও চোখে পড়ে। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুতর অন্তরায়। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর বিভিন্ন জীবনীর পাশাপাশি তাঁর নিজের রচনা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিকথা অবলম্বন করে সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর ভাবে তাঁর পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের ইতিহাস ও কালক্রম সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ – বিভূতিভূষণ, আদিশূর, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, নীলবিদ্রোহ, ভিষক বৈদ্য, কথকতা, পালাগান, বারাকপুর

ভূমিকা –

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত অন্বেষণ করতে গেলে প্রথমেই তাঁর পূর্বপ্রজন্মের ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয়। কোনো মহৎ স্রষ্টার জীবন-দর্শন বুঝতে গেলে তাঁর বংশধারা ও পারিবারিক উত্তরাধিকারের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। তবে বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় প্রামাণিক তথ্যের অভাব এবং প্রচলিত জীবনীগুলোতে বিদ্যমান পরস্পরবিরোধী মত একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভূতিভূষণের বংশ-পরম্পরার ইতিহাস রচনার এই প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত উৎসগুলিকে প্রামাণিক হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: লেখকের ডায়েরিতে ছড়িয়ে থাকা বংশগত বিবরণ, ঘনিষ্ঠ স্বজনদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত পারিবারিক আখ্যান এবং প্রচলিত জীবনীগ্রন্থে প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ তথ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধারার এই তথ্যনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ কেবল একটি পারিবারিক ইতিহাস নয়, বরং এটি তাঁর সাহিত্যিক মানস গঠনের এক অপরিহার্য দলিল।

পর্যালোচনা -

বিভূতিভূষণের স্মৃতির রেখা দিনলিপিতে তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বহস্ত-লিখিত একটি নোটবুকের উল্লেখ আছে। [১] এই বাঁধানো খাতাটিকে বিভূতিভূষণ ‘বাবার পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরি’ বলে অভিহিত করলেও ‘প্রকৃতপক্ষে এটি Field Book ধরনের। বোধহয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভূতিভূষণও পরবর্তী কালে আমৃত্যু প্রায় সর্বদা পকেটে এইরকম একটি খাতা বা নোটবই রাখতেন। যখনই ইচ্ছা হতো — পথের ধারে, অরণ্যের মধ্যে, নদীতীরের নিভৃত বনবিতানে বা পাহাড়ের সানুদেশে শিলাখণ্ডের ওপরে বসে সেই মুহূর্তের উপলব্ধির কথা লিখে রাখতেন। মহানন্দের এই খাতাটিও তাই। বংশপরিচয় থেকে শুরু করে সন্তানদের জন্মপত্রিকা,

বিভিন্ন অসুস্থতার ঘরোয়া প্রতিষেধক, স্থানিক বর্ণনা, সমসাময়িক ও প্রাচীন কবিদের রচনার পদ, নিজের লেখা গান ও কবিতা ইত্যাদি রয়েছে সেই খাতায়। এমনকি এর একটি পাতায় বিভূতিভূষণ তাঁর শৈশবে নিজের নাম অপটু হস্তাক্ষরে ইংরেজিতে লিখেছিলেন।' [২]

মহানন্দের এই নোটবইতে 'কুলপরিচয়' শীর্ষক একটি পদ্য রচনা দেখতে পাওয়া যায়। পয়ারবন্ধে গাঁথা এই রচনায় পুত্রের বংশপরিচয় জ্ঞাপন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

কুলপরিচয় মম শুন সর্বজন।
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হই ব্রহ্মপরায়ণ।।
ফুলিয়া খড়দহ সর্বানন্দী আর।
বল্লভী নামেতে বাঁধা আছে মেল চার।।
(সেই) খড়দহ মেলে থাকি, কুলে বড় খাঁটি।
বিভূতিভূষণ নাম, আমি বন্দ্যঘাটী।।
নবাই সবাই আর; বিখ্যাত সুন্দর।
ছিলেন পূর্বপুরুষ; তিন সহোদর।।
সুন্দরের কুলাভাব, এই কথা খ্যাত।
নবাই সন্তান নানা স্থানে পরিচিত।।
(আমার) সবাই বংশেতে জন্ম, জেনে রেখ মনে।
ভাবে ভঙ্গ নহি ব্যঙ্গ, সবে মোরে মানে।।
কুলিনের [যদ্দৃষ্টং] পরিচয় আর কত চাও।
মেকি টাকা নহি আমি বাজাইয়া লও।। [৩]

বাংলার প্রাচীন কুলাচার্যদের কুলজিশাস্ত্র থেকে জানতে পারা যায়, পালরাজত্বের অবসানের পরে শূরবংশীয় রাজা আদিশূরের শাসনকালে কান্যকুব্জ নিবাসী পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে এসে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন ভট্টনারায়ণ ও দক্ষ। রাজা আদিশূরের অনুগ্রহে ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র আদিবরাহ বন্দ্যঘটী গ্রাম ব্রহ্মত্র রূপে লাভ করেন এবং তাঁর বংশধররা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে প্রসিদ্ধ হন। অনুরূপ ভাবে, দক্ষের পুত্র সুলোচন চট্ট নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সুলোচনের বংশধররাই চট্টোপাধ্যায় পদবিতে পরিচিত। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্য ও কাশ্যপ গোত্রীয় চট্ট উভয় গাঞির অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণরাই নিকষ কুলীন বা মুখ্য কুলীন রূপে সমাদৃত হয়েছিলেন। [৪]

পরবর্তী কালে সেযুগের কুলীনদের মধ্যে কেউ কেউ কুলভঙ্গ করার ফলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ছত্রিশ প্রকার মেলের উদ্ভব হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন মেলের মধ্যে অগ্রগণ্য খড়দহ মেল। এঁদের পালটি মেল ফুলিয়ার চট্টোপাধ্যায়রা। [৫] খড়দহ মেলের সর্বানন্দ বা সবাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের পিতামহ। ফুলিয়া মেলের চট্টোপাধ্যায়রা তাঁর মাতৃবংশ। বিভূতিভূষণের অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ দর্পনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ছেলে লক্ষ্মণচন্দ্র। লক্ষ্মণচন্দ্রের পুত্র ত্রাহিরাম। ত্রাহিরামের সন্তান গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের মাতামহ। [৬]

বিভূতিভূষণের পূর্বপ্রজন্মের আদিনিবাস ছিল ইছামতীর তীরবর্তী ইটিন্ডা ঘাটের পূর্ব দিকে বসিরহাটের অন্তর্গত পানিতর গ্রামে। [৭] সম্ভবত তাঁরা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ ও ভূস্বামী। সেসময়ে "বড় বড় জমিদাররাও নিজেরা দল গড়ে ডাকাতি করতেন। সেসব প্রায় অরাজকতার দিনে এঁদের দমন করার মতো কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। সতীশচন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখদের গ্রন্থাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এমন ধারণা করা অনুচিত হবে না যে, বিভূতিভূষণের বংশের পূর্বপুরুষেরাও সম্ভবত এই পেশায় লিপ্ত ছিলেন।

বিভূতিভূষণ নিজেও বোধহয় ব্যাপারটা জানতেন। তাই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রারম্ভিক পাতাগুলিতে এর একটা আবছা আভাস পাওয়া যায়। 'পথের পাঁচালী' মূলত আত্মজৈবনিক উপন্যাস, অপুর চরিত্রটিও লেখক নিজের আদলেই তৈরি করেছিলেন। অপুর পিতা হরিহর, হরিহরের পূর্বপুরুষ ছিলেন ঠেঙাড়ে — নাম বীরু রায়। তিনি জমিদার এবং ভূস্বামী ছিলেন বটে, কিন্তু ডাকাতি ও নরহত্যা ছিল তাঁর সম্পদের অন্যতম উৎস। তাঁর হাতে এক ব্রাহ্মণ পথিক ও তার পুত্রের নিহত হওয়ার ঘটনা রচনার প্রথমদিকেই উল্লিখিত। কাজেই বোঝা যায়, অকীর্তিকর হলেও বিভূতিভূষণ সত্যকে অস্বীকার করে নকল বংশগৌরব প্রচার করেননি।" [৮]

বিভূতিভূষণের প্রপিতামহ ত্রাহিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন কবিরাজ। শোনা যায়, তিনি কার্যোপলক্ষে বারাকপুর অঞ্চলে বারকয়েক এসেছিলেন। [৯] বিভূতিভূষণের পিতামহ তারিণীচরণও পৈতৃক ব্যবসায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। শরিকি বিবাদের কারণে এবং উন্নত জীবিকার সন্ধানে তারিণীচরণ স্বগ্রাম ত্যাগ করে বারাকপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। [১০] তারিণীচরণের শ্বশুরবাড়ির দিকের কোনো কোনো আত্মীয় সেসময়ে এই অঞ্চলে বাস করতেন। বারাকপুর তখন ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত। পরে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বনগ্রাম মহকুমার এই গ্রাম যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। [১১]

বারাকপুর গ্রামের অদূরেই ছিল বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্নের মোল্লাহাটি নীলকুঠি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এই নীলকুঠিকে উপজীব্য করে রচিত। বারাকপুর গ্রামের কাছে বাজিতপুরের রাস্তায় সুন্দরপুর-সর্দারপাড়া অঞ্চলে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও লক্ষ করা যায়। আগেকার দিনে এই জায়গাটি 'কুঠির মাঠ' নামে পরিচিত ছিল। বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও দিনলিপির বহু জায়গায় 'কুঠির মাঠ' -এর উল্লেখ আছে। বর্তমানে অবশ্য সেই মাঠ আর নেই। দেশভাগের পরে 'কুঠির মাঠ'-এর বনজঙ্গল পরিষ্কার করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল 'শ্রীপল্লি' নামে নতুন একটি জনপদ।

বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, তারিণীচরণ 'ইছামতী' উপন্যাসের রামকানাই কবিরাজের মূল উৎস। 'উপন্যাসে আছে, রামকানাই বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্নের মোল্লাহাটির নীলকুঠিতে চাকরির আহ্বান পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা বা অর্থের প্রলোভনে নিজেকে বিক্রয় করেননি।' তারিণীচরণ অবশ্য ভিষক বৈদ্য রূপে নীলকুঠিতে চাকরি করেছিলেন। 'কিন্তু নিজের সততা বজায় রেখে'। [১২]

কিশলয় ঠাকুর তাঁর 'পথের কবি' বইতে লিখেছেন:

'বাংলাদেশময় তখন নীলকর সাহেবদের প্রায় সাড়ে তিনশ' কুঠিবাড়ি। ইছামতীর তীর বরাবরই তার দপদপিটা বেশি। দু' পার ধরে নীলের চাষ আর কুঠিয়ালদের কর্মকাণ্ড। বারাকপুর, নিশ্চিন্দিপুর, জয়পুর, দেবাতিয়া দুর্গাপুর, শিমুলিয়া, শাহী-বাজার, শিলহাটি, মোল্লাহাটি — কত কুঠি। মোট প্রায় সতেরটি কুঠি এ তল্লাটে। আর বারাকপুরের কাছে মোল্লাহাটি সদর দফতর। একে কেন্দ্র করেই দু' লাখের বেশি মানুষের বসবাস। যেন একটা আলাদা ঘন জেলা।

প্রকাণ্ড সব গভীর বাঁধানো খাল, ওরা বলে হৌস। পাশে বিরাট বিরাট চুল্লি, বক্সিপাড়ার বুনো সর্দার আর মুচি, ডোম, বাগদিরা দিন-রাত নীলের জারক করছে সেখানে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাজিরা পড়বে নায়েব, আমিন, দেওয়ানদের। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কুঠিয়াল সাহেবরা ঘুমজড়ানো চোখে হাই তুলতে তুলতে উঠবেন। একটু পরে চারদিক তাকাবেন। চাকর, নফর, গাবুরের সেবাবাহুল্যে চৌপায়ায় বসে তাজা হওয়া। খিদমদগার এগিয়ে দেবে জুতো, জামা, পাতলুন। এবার সাহেব বালাখানায় গিয়ে বসবেন। মুৎসুদ্দি-মোসায়েবের দল দণ্ডবৎ। হুজুরের মেজাজ শরিফ রাখতে পাঙ্খাওলা গলদঘর্ম। বড়, মেঝো, খুচরো, রেজগি কত সাহেব। পান থেকে চুন খসলেই – হেঁইও। বাজখাঁই গর্জন। তারপরই বালাখানায় তলব। এটাই কাছারি, এখানেই বিচার, দণ্ডমুণ্ড বিধান। দেশের শাসন তখনও ওদের

সগোত্রদের হাতে। এ-নিয়ে অতএব বোঝাপড়াটা সহজেই হত। কুঠিয়াল সাহেবরাও নির্ভাবনায় যখন তখন লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চাপেন, টমটম হাঁকান। চাবুক বাগিয়ে গোটা তল্লাট চটিয়ে ফেরেন দাবড়ে। দাপটে দিগ্বিদিক গমগম।

সরগরম তখন বারাকপুরের গোপালনগর ডাকঘরও, নীলকুঠির টাকার শব্দে। এই এলাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে সরকারি সারভে বিভাগ মেজর আর. স্মিথকে দিয়ে আঁকিয়ে আলাদা এক মানচিত্র বার করে ফেললেন আঠারশ' পঞ্চাশে। তাতে মোল্লাহাটির সঙ্গে বারাকপুর-গোপালনগরের ডবডবিটাও বোঝানো হল বিশেষ করে। ওই উত্তাপেই তখন সেখানে নিত্য-নতুন লোকের আনাগোনা, কর্মকোলাহল।' [১৩]

তাই 'পোঁটলা-পুঁটলি, হামানদিস্তা আর চরক-সুশ্রুত-মাধব নিদানের বানডিল বগলে পিতামহ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, একদা এখানে এসে দাঁড়ালেন। না, আর হন্যে হয়ে ঘোরা নয়। লক্ষ্মী যদি ধরা দেন, এখানেই দেবেন।' [১৪]

বিভূতিভূষণের ইছামতী উপন্যাসে মোল্লাহাটির নীলকর শিপটন সাহেবের উল্লেখ আছে। তারিণীচরণ বারাকপুরে এসেছিলেন সম্ভবত শিপটনের আমলে, নীলবিদ্রোহের অনতিকাল পূর্বে।

বিভূতিভূষণ তাঁর পিতামহকে দেখেননি। তবে তাঁর চিকিৎসক পেশার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বেশ কয়েকটি ডাক্তার চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটভাই নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন।

তারিণীচরণরা ছিলেন দুই ভাই। তাঁর আর-এক ভাই কালীচরণ পানিতরেই থেকে যান। কালীচরণের সন্তান গোলোক আর মেনকা। [১৫] মেনকার বিয়ে হয়েছিল বারাকপুর গ্রামের অদূরে ইছামতীর ওপারে মাধবপুর ছাড়িয়ে বাগানগাঁয়ে। [১৬] বিভূতিভূষণের বাল্যকালে বালবিধবা মেনকা, মহানন্দের সংসারেই থাকতেন। বিভূতিভূষণের সহধর্মিনী রমা বন্দ্যোপাধায় লিখেছেন, 'বিপদে-আপদে সবসময় মেনকা দেবী আমার শ্বশুরবাড়ির সংসারে জড়িয়ে থাকতেন। ওঁর কেউ ছিল না, তাই একটু দূরসম্পর্কের আমাদের এই পিসিমা সংসার আগলে ছিলেন। উনি আমাদের বাড়ী-ঘর-দোর ঝাঁট পাট দিয়ে সবসময় পরিষ্কার-পরিচছন্ন করে রাখতেন, একগাছা কুটোও পড়ে থাকতে পারত না উঠোনে। খিড়কী দোর দিয়ে নদীর দিকে যাবার যে রাস্তা ছিল আমাদের বাঁশতলা হয়ে, সে রাস্তাটি নাকি ঝকঝক করত আমার পিসশাশুড়ী ঠাকরুণের যত্নে ও পরিচর্যায়।' [১৭] 'পথের পাঁচালী'-র ইন্দির ঠাকরুনের চরিত্রটি অনেকখানি মেনকা পিসিমার আদলে গড়া। [১৮] সেইসঙ্গে চরিত্রটির আড়ালে বিভূতিভূষণের আর-এক পিসি রাখালী পিসিমারও কিছুটা ছায়া আছে।

'ঊর্মিমুখর' দিনলিপির একজায়গায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন:

'আজ সকালে বাগান-গাঁয়ে পিসিমার বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে পড়েচি। আজ দিনটা সকাল থেকে মেঘ ও বৃষ্টি, পথ হাঁটার পক্ষে উপযুক্ত দিন, রোদ নেই, অথচ বৃষ্টি খুব বেশিও হচ্চে না। ঠান্ডা জোলো হাওয়া বইচে মাঝে মাঝে ... কুঠির মাঠ দিয়ে, বৃষ্টি-ধোয়া বনঝোপের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কি আনন্দই পেলাম। পথ হাঁটতে আমার বড় আনন্দ। ... পিসিমার বাড়ি বেলা একটার সময় পৌঁছে দেখি পিসিমা খেতে বসেছেন। আমিও স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করলুম। পিসিমার ঘরটাতে কেমন একটা পুরনো পুরনো গন্ধ পাওয়া যায়। ১৩০০ সালের পরে আর এ ঘরে নতুন পাঁজি আসেনি (১৩০০ সালে পিসেমহাশয় মারা গিয়েছিলেন)। সেকালের গন্ধে, সেকালের আবহাওয়ায় ঘরটা ভর্তি। কড়ির আলনা, সেকালের কাঁথা, কড়ির চুবড়ি, কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, গরুড় মূর্তি বসানো পেতলের ঘন্টা, বেতের প্যাঁটরা — যেসব জিনিস একালে কোনও বাড়িতে দেখা যায় না। একখানা কাশীদাসী মহাভারত আছে ১২৭৬ সালে ছাপা। অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে সেইসব প্রাচীন দিনের বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিলাম, কত পুরনো দিনের কথা মনে হয় ... যেদিন মেনকা পিসিমা আমার বাল্যে বাবার ওপর রাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন, ... বাবা এসে একবার কথকতা করেছিলেন।' [১৯]

‘পথের পাঁচালী’-তে সর্বজয়ার ওপরে রাগ করে ইন্দির ঠাকরুনের গৃহত্যাগের বর্ণনা আছে। উর্মিমুখর-এর এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, বাস্তবে মেনকা পিসিমার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল মহানন্দের। [২০]

মেনকা দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে একাধিক বার মেনকা পিসিমার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাগানগাঁয়ে যাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর ‘বংশলতিকার সন্ধানে’ গল্পটি সেই অভিজ্ঞতার সূত্রেই লেখা। বিভূতিভূষণ তাঁর ‘দৃষ্টি-প্রদীপ’ উপন্যাসটি ‘পিসিমা – মেনকাদেবীকে’ উৎসর্গ করেন। [২১]

তারিণীচরণ ও কাশীশ্বরীর পাঁচ সন্তান – মহানন্দ, শ্যাম, রাম, মধু ও যোগেন। [২২] মহানন্দের দুটি বিবাহ। নিঃসন্তান প্রথম পত্নী হেমাঙ্গিনীর অনুরোধে বংশরক্ষার অভিপ্রায়ে মহানন্দ পুনর্বার বিবাহ করেন মৃণালিনীকে। মহানন্দ ও মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিভূতিভূষণ। হেমাঙ্গিনীকে বিভূতিভূষণ বলতেন ‘বড়মা’। [২৩] রমা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘উনি আমার শাশুড়ী ঠাকরুণের পরে মারা যান। ওঁর মুখে শুনেছি, আমাদের বড়মা অত্যন্ত ভালমানুষ ছিলেন। সতীনের ছেলেমেয়েদের উনি অসম্ভব ভালবাসতেন। আমার শাশুড়ী ঠাকরুণে বিয়ের পরও উনি ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম নিয়ে সংসার আগলে ছিলেন। ছেলেপুলেদের নিয়ে। আমার স্বামী অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন বড়মাকে এবং বড়মাও যে ওঁদের খুব ভালবাসতেন সে কথা উল্লেখ করতেন সর্বদা।’ [২৪] শৈশবে দুই মায়ের স্নেহধারাতেই বিভূতিভূষণ সমান ভাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

মহানন্দের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়েছিল তারিণীচরণের তত্ত্বাবধানে। শৈশবে তিনি নিজ গৃহেই পিতার কাছে সংস্কৃতের পাঠ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি, নীলকুঠিতে কর্মরত পাড়াপড়শিদের সংস্পর্শে আসায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গেও তাঁর যৎসামান্য পরিচয় ঘটে। জীবনের শুরুর দিকে পড়াশোনায় তাঁর বিশেষ মনোনিবেশ ছিল না। মহানন্দের পিতা তারিণীচরণ নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ না পেলেও সাহেবদের কুঠিতে কাজের সুবাদে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে মহানন্দকে ভর্তি করিয়ে দেন। শোনা যায়, মহানন্দ এনট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তবে তাতে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। [২৫]

পরম্পরাগত কবিরাজি ব্যবসাতেও মহানন্দের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাঁর টান ছিল কবিগান আর কথকতায়। তাঁর কবিপ্রতিভা ছিল সহজাত। বাল্যকাল থেকেই তিনি মুখে মুখে পালাগান বাঁধতে পারতেন। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী। মহানন্দ বিখ্যাত কথক উদ্ধব শিরোমণির শিষ্য ছিলেন। বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘আমার বাল্য ও কৈশোরে আমাদের দেশের বাড়ির গ্রামে এমন অনেকে জীবিত ছিলেন, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন। তাঁরা আমাকে বলতেন: “বুঝলে হে, গানের গলা ছিল বটে তোমার ঠাকুরদার! চাকদা-বনগাঁ সড়ক থেকে রাত্রিবেলা যখন গান গাইতে গাইতে গ্রামের পথে নামতেন, তখন এই এতদূর থেকেও সবাই শুনতে পেয়ে বলত—ঐ মহানন্দ আসছেন।” ’পথের পাঁচালী’-র হরিহর চরিত্রটি বিভূতিভূষণ নিজের পিতার আদর্শেই নির্মাণ করেছিলেন। মহানন্দও হরিহরের মতোই শাস্ত্রী পণ্ডিত ছিলেন, কথকতার আসরে মুখে মুখে বানিয়ে তাৎক্ষণিক কবিতা বলতে ও গান গাইতে পারতেন। তাঁর আসর হবে খবর পেলে উৎসাহী শ্রোতারা দূর দূর গ্রাম থেকে এসে উপস্থিত হতো। কেবল স্বগ্রামে নয়, বছরের অর্ধেক সময় ঘুরে বেড়াতেন দেশে-বিদেশে।‘ [২৬]

মহানন্দের কৈশোর ও যৌবনে বনগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কীর্তন ও পালাগানের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বারাকপুরের অনতিদূরে অধুনা যশোর জেলার অন্তর্গত উলশি (উলুশিয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট লোককবি ও সংগীতশিল্পী মধু কান বা মধুসূদন কিন্নর। তাঁর পিতার নাম ছিল তিলকচন্দ্র কিন্নর। শৈশবে দারিদ্র্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে না পারলেও সংগীতের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি ঢাকার ওস্তাদ ছোটে খাঁ ও বড়ে খাঁর কাছে খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরিতে তালিম নেন। পরবর্তী জীবনে যশোরের রাধামোহন বাউলের কাছে তিনি ঢপ সংগীত ও কীর্তন শিক্ষা করেন। মধুসূদন প্রচলিত কীর্তন এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের সংমিশ্রণে এক নতুন ধারার কীর্তন প্রবর্তন করেন, যা ঢপকীর্তন নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর রচিত পালাগুলির

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‘অক্রূর সংবাদ’, ‘কলঙ্কভঞ্জন’, ‘মাথুর’ এবং ‘প্রভাস’। তিনি তাঁর গানের শেষে নিজের নামের বদলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘সূদন’ ভনিতা ব্যবহার করতেন। সেযুগের আর-একজন খ্যাতনামা সংগীত-সাধক মোহনদাস বৈরাগী বা মোহন সরকারের নিবাস ছিল বারাকপুরের কাছেই গোপালনগরে। তিনি ঢপ কীর্তনে ছুটি সংগীত বা ছুট সংগীতের প্রবর্তন করে এই সংগীত-শৈলীকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। মহানন্দের নোটবইতে মধু কান ও মোহনদাস বৈরাগীর লেখা বেশ কয়েকটি গান স্থান পেয়েছে।

দেশজ সংগীতের ঐতিহ্যবাহী এই ধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে পালাকীর্তন আর কথকতার মাধ্যমেই জীবিকা অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন মহানন্দ। তারিণীচরণ তা মেনে নিতে পারেননি। পুত্রের মতি স্থির করতে তিনি তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন বারাকপুরের সন্নিকটে বৈরামপুরের সম্পন্ন জমিদার পরিবারে। রানাঘাটের নামজাদা উকিল রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভগিনী হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে। [২৭]

বিবাহের অল্পকাল পরেই তারিণীচরণের কাছে তিরস্কৃত হয়ে বালিকা বধূকে ফেলে রেখে ক্ষুব্ধ মহানন্দ গৃহত্যাগ করেন। সেইসময়ে পায়ে হেঁটে ও রেলপথে তিনি পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পশ্চিম প্রবাসের এই পর্বে মহানন্দ দীর্ঘদিন কাশীতে ছিলেন। কাশীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। সেইসঙ্গে রাগসংগীতেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য জন্মায়।

পশ্চিম ভারত ভ্রমণকালে মহানন্দ আরও একটি জিনিস শিখেছিলেন। সেটি হল হিন্দিভাষা। বারাকপুরে ফিরে এসে স্বপ্নদর্শী মহানন্দ ভিটেবাস্তুর দরজার কাঠের ফ্রেমে দেবনাগরী অক্ষরে খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছিলেন – ‘অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা’। [২৮] বঙ্গবাসী পত্রিকার হিন্দি সংস্করণেরও নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন তিনি।

মহানন্দ যখন বারাকপুরে ফিরে আসেন, ততদিনে তারিণীচরণ ও কাশীশ্বরী প্রয়াত হয়েছেন। বৈরামপুর থেকে হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে এসে তিনি নতুন করে গেরস্থালি পাতেন পিতৃপুরুষের পুরানো ভিটেয়। শুরু হয় তাঁর পালাগানের চর্চা। কথকতাই হয়ে ওঠে তাঁর জীবিকা। গোপালনগর ডাকঘরে ১৯১০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি যে সেভিংস অ্যাকাউন্টটি খুলেছিলেন, তার পাসবইতে লেখা আছে — ‘Depositor’s Name: Mahananda Bandyopadhyay, Son of Late Tarini Charan Bandyopadhyay, Occupation/ Profession: Kathakata’। [২৯]

বারাকপুরের গ্রামীণ পরিবেশের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরের জগতে পাড়ি দেওয়ার ফলে মহানন্দের মনের আশ্চর্য প্রসার ঘটেছিল। বৃন্দাবনের ‘চীরঘাট’ দর্শন করে তিনি নোটবইতে লিখেছিলেন: “চীরঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। ‘চীরঘাট’ অর্থাৎ বস্ত্রহরণের ঘাট, এইখানেই কৃষ্ণ গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মহাত্মাই ছিলেন বটে!!!” [৩০] নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে উনিশ শতকের আটের দশকে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থে দাঁড়িয়ে এমন প্রথাবিরোধী নির্ভীক উচ্চারণ তাঁর মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দেয়।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মুরাতিপুরের গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও গিরিবালা দেবীর জ্যেষ্ঠকন্যা মৃণালিনীর সঙ্গে মহানন্দের দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। কথিত আছে, স্বামীর জন্য পাত্রী জোগাড় করেছিলেন স্বয়ং হেমাঙ্গিনী। মহানন্দ তাঁর নোটবইতে লিখে রেখেছেন: ‘১২৯৬ সন। ২৪ জ্যৈষ্ঠ পক্ষান্তরে বিবাহ করি। এই মাসেই পরিবারের বয়স পূর্ণ ১২।’ দ্বিতীয় বিবাহের অল্পকাল পরে মহানন্দ সপরিবারে কাশী গিয়েছিলেন এবং সেখানে পুত্রকামনায় কার্ত্তিক পূজা করেন। [৩১] কাশী থেকে ফিরে সপত্নীর ঘর-সংসার গুছিয়ে দিয়ে হেমাঙ্গিনী বৈরামপুরে নিজের পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। বিভূতিভূষণের জন্মের সংবাদ পেয়ে তিনি শিশুপুত্রকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি কাশীবাসী হন এবং সেখান থেকে আর কখনও ফিরে আসেননি। [৩২]

উপসংহার –

গৃহী হয়েও মহানন্দ ছিলেন গৃহবন্ধনে নির্লিপ্ত। বিষয়-আশয়ের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। নিরুপদ্রব গৃহকোণ ছেড়ে তিনি বারবার বেরিয়ে পড়তেন অজানার উদ্দেশে। পরিণত বয়সে বিভূতিভূষণ তাঁর পিতার এই বৈরাগ্য আর যাযাবর মানসিকতা উত্তরাধিকার সূত্রেই অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক সত্তার নেপথ্যেও ছিল মহানন্দের সৃষ্টিশীল কবিস্বভাব। বিভূতিভূষণের অন্তর্লোকে তাঁর কবিরাজ পিতামহ তারিণীচরণের প্রেরণাও সুগভীর। জীবনভর তাঁর কথাসাহিত্যে তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন যুগব্যাধির বিশল্যকরণী।

সূত্রনির্দেশ -

1. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতির রেখা, বিভূতি রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ: প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ২৪৪
2. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪১৩
3. পূর্বোক্ত
4. হরিলাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ-ইতিহাস, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, চক্রবর্তী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, পৃ. ৪৯-৫০
5. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
6. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, পৃ. ৪১৪
7. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – সপ্তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৮৮
8. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪১১
9. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৭০, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ. ১
10. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১১ তম বর্ষ – তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১৯৩
11. কিশলয় ঠাকুর, পথের কবি, প্রথম সংস্করণ: চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৭
12. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – সপ্তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৮৮
13. কিশলয় ঠাকুর, পথের কবি, পৃ. ১৭-১৮
14. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
15. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – সপ্তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৮৮
16. পূর্বোক্ত
17. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাছে থেকে দেখা, প্রথম প্রকাশ: দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪০২ বঙ্গাব্দ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৭
18. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – সপ্তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৮৮
19. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊর্মিমুখর, বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ: প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ৪০৯-৪১০
20. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – সপ্তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪৮৮
21. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দৃষ্টি-প্রদীপ, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পি সি সরকার অ্যান্ড সনস, কলকাতা, উৎসর্গ পত্র
22. রুশতী সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৩১

23. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
24. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাছে থেকে দেখা, পৃ. ২৭
25. চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিত বিভূতিভূষণ, প্রথম প্রকাশ, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা, পৃ. ১৩
26. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪১২
27. কিশলয় ঠাকুর, পথের কবি, পৃ. ২০
28. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১০ তম বর্ষ – ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৪১২
29. রুশতী সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩২
30. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা নোহসি, উদ্বোধন, ১১১ তম বর্ষ – চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ২৬৫
31. চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিত বিভূতিভূষণ, পৃ. ১৮
32. রুশতী সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৪